প্রথম অধ্যায়
দেবেশ রায়ের ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যকৃতি

দেবেশ রায়ের জন্ম ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর। অধুনা বাংলাদেশের পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। পিতা ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়, মাতা অপর্ণা দেবী। পিতামহ উমেশ চন্দ্র রায় (১৮৬৪-১৯৪৪) পেশায় শিক্ষক। ইনি ১৯১৮ সালে জলপাইগুড়ি জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। মাতামহ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, মাতামহী সরলা সুন্দরী।

দেবেশ রায়ের শৈশব কেটেছে পাবনা জেলার বাগমারা গ্রামে। মাত্র সাত বছর বয়সেই তাঁর পরিবার পাকাপাকি ভাবে চলে আসেন জলপাইগুড়িতে। স্বভাবতই শৈশবের ওপার বাংলার স্মৃতি তাঁর মনকে তেমন ভাবে নাড়া দিতে পারেনি। তিনি লিখছেন—

> ''পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা পূর্ববঙ্গ থেকে এসে আছেন, তাঁরা বাংলাদেশকে এক স্থায়ী স্মৃতি দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্গত করে নিয়েছেন। আমি নিজেকে এই আবেগ গড্ডল থেকে বাঁচাতে চাই।''[১]

তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই তিনি এই কথা বলেছেন। পরবর্তীতে দেবেশ রায়ের সাহিত্য সম্ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখলেই বিষয়টি আরো পরিস্কার হয়ে উঠবে। তাছাড়া অহেতুক 'নষ্টালজিক' হওয়াও তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই হয়তো তিনি বারদুয়েকের জন্য বাংলাদেশে গেলেও জন্ম ভিটেতে ফিরে যান নি। তবে কিছু খণ্ড স্মৃতি তাঁর মানসপটে আবছা হলেও রয়ে গিয়েছে তিনি মনে করতে পারেন না বাগমারার সেই বাড়ির সম্মুখ কোনটি বা পেছন কোনটি। সত্তর বছর বয়সে তাঁর আবছা মনে পড়ে গাছ-গাছালি ঘেরা একটা কাল দিঘি। সেই দিঘির জলে কেউ তাকে নিয়ে গিয়ে আঁজলায় জল তুলে তাঁর চোখে মুখে সাপটে দিয়ে আঁচলে মুখ মুছিয়ে দিয়েছিল। সেই গন্ধের অনুভূতি এখনও তাঁর স্মৃতিতে বর্তমান। লেখকের মনে আছে বাগমারা গ্রামের লালচাঁদ দাদাকে তার ছেলে রমজান যিনি পরবর্তীতে জলপাইগুড়ির বাড়িতে ছিলেন এবং ভাইদের দেখাশুনা করতেন।

পিতা ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় (১৯০৫-১৯৬৬) এর চার পুত্রর। দিনেশ চন্দ্র রায় (প্রয়াত)

, দেবেশ রায়, সমরেশ রায় ও সিদ্ধার্থ রায় (অকাল মৃত্যু) এবং তিন কন্যা। ভাই সমরেশ রায় যিনি ১৯৬৯ সালে ' দেবেশ রায়ের গল্প' নামে লেখকের প্রথম গল্প সংকলন প্রকাশ করেন। পরবর্তী সময়ে 'কঙ্ক' পত্রিকায় 'কবে কোন লেখা' নামে দেবেশ রায়ের রচনা সম্ভাবের গুরুত্বপূর্ণ একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন। ১৯৬২ -তে তিনি বিবাহ করেন কাকলি রায়কে। তিনি সঙ্গীত শিল্পী। পুত্র দেবর্ষি রায়। ডাকনাম তিতির। সন্তানের দেবর্ষি নামটি দিয়েছেন বিশিষ্ট লেখক বন্ধু দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবেশ রায়ের স্কুল ও কলেজ জীবন কাটে জলপাইগুড়ি শহরে। ১৯৪৩-এ সাত বছর বয়সে জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসার পর তিনি জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ভর্তি হন এবং সেই স্কুল থেকেই ১৯৫২ সালে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাশ করেন এবং জলপাইগুড়ি শহরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আনন্দচন্দ্র কলেজে আই.এ ক্লাসে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকেই ১৯৫৬ সালে বাংলা সাহিত্যে অনার্স সহ বি.এ. পাশ করেন। পরবর্তীতে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৮ সালে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। এরপর জলপাইগুড়ি ফিরে আসেন এবং আনন্দচন্দ্র কলেজে অধ্যাপনায় যুক্ত হন। ১৯৭৫ সালে কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে চলে যাবার পূর্বে তিনি এই কলেজে অধ্যাপনায় নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতায় গিয়ে নতুন কর্মক্ষেত্র 'সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স'-এ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন। ১৯৯৭ সালে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

দেবেশ রায়ের রাজনৈতিক জীবন :

রাজনীতিতে দেবেশ রায় ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় সর্বক্ষণের কর্মী। পার্টির কর্মী হিসেবে তিনি জলপাইগুড়ি জেলার নেতৃত্ব দেন। রাজনীতির অঙ্গনে তিনি আসেন দাদা দিনেশ চন্দ্র রায়ের হাত ধরে। পারিবারিক পরিবেশে রাজনীতির হাওয়া এসেছিল দিনেশ চন্দ্রের মাধ্যমেই। বাল্য বয়সেই দাদার কাছে কমিউনিস্ট মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এবং পার্টির আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সমবয়সী বন্ধুদের কাছে সবসময় তাঁকে ঠাট্টা-তামাশার লক্ষ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হলে মাত্র ১৪ বছর বয়সে স্কুল জীবনে পড়াকালীন সময়েই তিনি গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনায় তিনি জলপাইগুড়ির রাজনীতির অঙ্গণে ঐ বয়সেই একটা জায়গা করে নিয়েছিলেন। তাছাড়া সামাজিক-সাংস্কৃতিক পারিবারিক

পরিচিতির কারণে তিনি সবসময়েই বড়দের প্রশ্রয় ও প্রশংসা পেতেন। কিশোর বয়সে রাজনীতির প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়ার পর জলপাইগুড়িতে প্রথম জনসমাবেশ হয় ১৯৫০ সালে মাদ্রাসার ময়দানে—

> ‘‘মাদ্রাসার ময়দানে একটা ছোট্ট লাল ঝাণ্ডা পুঁতে মাঠের ভিতর বসে আছেন অনিল মুখার্জী।... মনে আছে শুধু এইটুকু যে আমি পায়ে-পায়ে রাস্তা থেকে ঐ শূন্য মাঠের ভিতর নেমে পড়েছিলাম-অনিলদা’র দিকে যাচ্ছিলাম না ঝাণ্ডার দিকে তা আজ মনে নেই, সম্ভবত তখনও তা জানতাম না।’’[২]

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন-উদ্‌ঘাটন তাঁর কল্পনাকে তেমন নাড়া দিতে পারেনি। অথচ সেই সময় যাঁর স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে মার্ক্সবাদ কমিউনিজমে নিজেদের কর্মের যোগ্য ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন কিংবা যাঁরা মার্ক্সবাদের বিগ্রহ হিসেবে লেলিন-স্তালিনকে দেখেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিংশ কংগ্রেসে স্তালিন উদ্‌ঘাটন তাদের সমস্ত হিসেব গুলিয়ে দিয়েছিল। কমিউনিস্ট মতাদর্শের এত বড় বিভেদেও সেই সময় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙ্গন দেখা দেয় নি, বরং তখন পশ্চিমবঙ্গে আত্মবিশ্বাসী কমিউনিস্ট পার্টি রাজ্যে বিকল্প সরকার গড়ার ডাক দিয়েছিল। কিন্তু ৬২’র চীন-ভারত যুদ্ধে অক্টোবরে চীন-আসাম সীমান্তে এসে গেলে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যায়। পার্টি সি.পি.আই ও সি.পি.আই (এম) দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় লেখক মূল পার্টি সি.পি.আই. -তেই রয়ে গেলেন। এবং আরও বেশি করে পার্টিকে সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সেই সময় তিনি উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পার্টির কাজ করার জন্য গ্রামেই বেশিরভাগ সময় কাটাতেন। সেই সূত্রে তিনি রাজবংশী ভাষাকেও দ্রুত আয়ত্ত করে ছিলেন। যার ফলস্বরূপ পরবর্তী সাহিত্য রচনায় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কথা ও রাজবংশী ভাষার প্রয়োগ তাঁর সাহিত্য সম্ভারকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গিয়েছে।

১৯৬৫ সালে রাজ্যে দুর্ভিক্ষের করালগ্রাস নেমে এসেছিল। ক্ষুধা যে কী জিনিষ এবং তা যে কতটা ভয়ঙ্কর আকার নিতে পারে তা তিনি সরাসরি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন

গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করার সূত্রে। ৬৫-র দুর্ভিক্ষ কাটতে না কাটতেই ৬৭' তে রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। এই নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলো। কিন্তু এই জয় বামপন্থীদের কাছে কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসেছিল। কিছু দিনের মধ্যেই এই সরকার ভেঙ্গে গেলে ১৯৬৯-র নির্বাচনে আবারও প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। নকশালবাড়িতে সৃষ্ট নকশাল আন্দোলনের সমাধান করতে পারেনি যুক্তফ্রন্ট সরকার। '৬৭ থেকে '৬৯-র প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ আক্রমণের আক্রামনাত্মক আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল। সি.পি.আই. (এম) ও নকশালরা সম্মুখ যুদ্ধে আটকে পড়ে গেলেন। তার সম্পূর্ণ সুযোগ নিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। এক কলঙ্কজনক নির্বাচনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও তাঁর কংগ্রেস দল। প্রসঙ্গত তাঁকে সহযোগিতা করে সি.পি.আই.। এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

> ''রাষ্ট্র তার সমস্ত শস্ত্র দিয়ে আমাদের গলা টিপে ধরে ছিল, শ্বাস নেওয়ার মত ফাঁক ছিল না। সমস্ত রকম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্কে এক অবিশ্বাস আমাদের একে বারে ভিতরে সেঁদিয়ে গেল। সে বিশ্বাস বোধহয় আর কখনোই কাটবার নয়।''[৩]

সেই সময় তিনি যতদিন জলপাইগুড়িতে ছিলেন সারাক্ষণ পার্টিরই কাজ করতেন। ১৯৬২-৭২ তিনি জলপাইগুড়ির কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী ছিলেন। বাল্যকালে দাদার কাছ থেকে পাওয়া কমিউনিস্ট আদর্শের প্রতি তাঁর বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় শক্তির ক্ষমতার অপপ্রয়োগে ক্রমশ ভেঙে যায়। সেই সময় পার্টির সাংগঠনিক বিস্তারের অভিজ্ঞতা ও সাধারর মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার দরুণ তাঁর লেখক সত্তার ভিত মজবুত করে তুলেছিল। রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে তাঁর খ্যাতি এবং যে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে তিনি নিজের ও সমাজের চালিকা শক্তি বলে মনে করেন, আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে কমিউনিজমের এক বিধ্বস্ত রূপ লেখকের বিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে গল্প সমগ্রের পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকাংশে তিনি লিখছেন—

''আশির দশক শেষ হতে না হতেই প্রায় আনবিক বিস্ফোরণের মত প্রচণ্ডতায় অথচ প্রায় বিস্ময়কর নীরবতায় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এক দ্রুত ধ্বংসের মধ্যে ঢুকে গেল। আর বছর তিন চারের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পরিচয় মানচিত্র থেকে মুছে গেল। আমার চেতনার কোনো অস্পষ্ট শুরু থেকে সমাজতান্ত্রিক স্বপ্ন এক রাজনৈতিক কল্পনা হয়ে উঠেছিল। সে কল্পনা প্রতিদিন পুষ্ট হয়েছে এই ভারতীয় বাস্তবতার দৈনন্দিনে। সমালোচনা ছিল, আপত্তি ছিল, সংশয় ছিল তবু এসব কিছুর ওপর ছিল এক ধ্রুব বিশ্বাস। সে বিশ্বাসের আর কোনো মাটি রইল না, রইল না কোনো বিকল্প কল্পনা রচনার উপাদান।''[৪]

১৯৭৫ সালে কলকাতায় পাকাপাকি ভাবে চলে যাবার পূর্বে রাজনীতি ও লেখক সত্তা তাঁর মধ্যে অভিন্ন ভাবে থাকলেও ক্রমশ দেবেশ রায়ের লেখক সত্তা অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ব্যক্তি ও সমাজজীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাঁর রচনা মূল বিষয় এবং সে বিষয়কে অবলম্বন করে তিনি একের পর এক জীবনমুখী সাহিত্য পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তার কথায়—

''সে অবলম্বন টুকু নিয়েই লিখব, বাঁচব। এটাও কেবল আশাই, যে আশা ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না, যতটুকু জীবৎকালই অবশিষ্ট থাকুক না কেন এই আশাটুকু ছাড়া সেটুকুও পাড়ি দেওয়া যাবে না।''[৫]

সম্পাদক ও সাংবাদিক দেবেশ রায় :

সাংবাদিকতার সঙ্গে দেবেশ রায়ের সম্পর্ক বাল্যকাল থেকেই। ছোটোবেলায় তিনি জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'জনমত' ও 'ত্রিস্রোতা' পত্রিকায় সাংবাদিক লেখাই লিখতেন। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে পার্টির পত্রিকায় খবর সরবরাহের কাজে তাঁর সাংবাদিকতার পরিচয়ই প্রধান হয়ে ওঠে। জলপাইগুড়ি থেকে তিনি 'উত্তর বাংলা' ও কিছুকাল পরে ষাটের দশকের গোড়ায় 'উত্তরদেশ' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন।

১৯৭৫ সালে কলকাতায় আসার পর তিনি সবচেয়ে বেশি সাহচর্য পেলেন লেখক

সম্পাদক বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছ থেকে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ‘পরিচয়’ পত্রিকার সম্পাদক। এছাড়াও ‘কালান্তর’ পত্রিকায় ‘রবিবারের পাতা’ ও শারদীয় সংখ্যা প্রকাশের দায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। এই দুই পত্রিকার সঙ্গে দেবেশ রায়কে কাজে জড়িয়ে ফেলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। লেখকের কথায়—‘‘আমি কলকাতায় আসার পর দীপেন আমাকে কোনো প্রস্তুতির অবকাশ দেয়নি। তার কাজ-কর্মে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে নিল।’’[৬] দীপেন্দ্রনাথের ইচ্ছাতেই তিনি ‘প্রগতি লেখক সংঘ’-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন। পরবর্তীতে তার অন্যতম সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন বন্ধু দীপেন-এর ইচ্ছাতেই। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময় দীপেন-এর নেতৃত্বে ‘বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধ সহায়ক’ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-সমিতি’ তৈরি হয়। এবং এই সমিতির কাজ-কর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশের শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পরিচয় লাভের প্রথম সুযোগ ঘটে। ‘পরিচয়’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পেরেছিলেন সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ। এই পত্রিকার সাহিত্য আড্ডাতেই দেবেশ রায় তাঁর লেখক সত্তাকে আরো জোড়ালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। কিন্তু ১৯৭৯ -র ১৪ই জানুয়ারি সকালে আকস্মিক ভাবে দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যু লেখকের কাছে একটি অপূরণীয় ক্ষতি। কলকাতায় আসার চার বছরের মাথায় তিনি যেন অবলম্বনহীন হয়ে পড়লেন। কেননা তার মাত্র এক বছর আগেই লেখক হারিয়েছে তার অন্যতম অবিভাবক দাদা দিনেশচন্দ্র রায়কে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যাওয়ার পর পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব এসে পড়ে দেবেশ রায়ের ওপর। এই কাজে তাকে নিত্য সাহচর্য দিতেন কবি বন্ধু অরুণ সেন।

দাদা দিনেশচন্দ্র রায় ও বন্ধু দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর লেখকের লেখালেখি বন্ধও হয়ে যেতে পারত। এই দুটি মৃত্যুর ঘটনা তাকে মানসিকভাবে এতটাই নাড়িয়ে দিয়েছিল, লেখকের কথায়—

> ‘‘পর-পর দু’বছরে দাদা আর দীপেনের মৃত্যুতে আমার লেখালেখির কাজটা কেমন ফাঁকা আর অর্থহীন হয়ে গেল হঠাৎ, কেমন বন্ধুশূন্য ও সমর্থনশূন্য হয়ে গেল। যেন আমার কারো কাছে কোন দায় রইল না।

আমাকে নিয়েও কারো কোনো দায় থাকল না।''[৭]

১৯৭৯ পর দেবেশ রায়ের লেখালেখি বন্ধ হয়ে যেতে পারত। কিন্তু বন্ধ না হওয়ার অন্যতম কারণ 'পরিচয়ে'র সম্পাদনার দায়িত্ব তার। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর তরুণ লেখকদের নিয়ে নতুন করে লেখার জগতে প্রবেশ। এরপর ১৯৮৩ তে তিনি 'প্রতিক্ষণ' নামে একট পাক্ষিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হন। পরে এই পত্রিকাটি অবশ্য মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকার মূল সম্পাদক না হয়েও তাঁকে যৌথ সম্পাদনার ভার অনেকখানি বহন করতে হত। এছাড়াও পত্রিকার সাংবাদিকতা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ দেখাশোনা করতেন লেখক স্বয়ং। এই পত্রিকাটি ছিল একটি 'বাংলা ভাষায় সর্বভারতীয় পত্রিকা'। পত্রিকার সর্বভারতীয়তা রক্ষার সূত্রে লেখককে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হত সংবাদ সংগ্রহের জন্য এবং সেই সূত্রেই লেখকের কাছে সমগ্র ভারতবর্ষের চিত্র পরিস্ফূট হয়ে উঠেছিল। যা পরবর্তীতে তাঁর রচনাকে পরিপূর্ণতা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

১৯৪৯ সালে প্রতীক্ষণ থেকে একটি ইংরেজি পাক্ষিক পত্র 'Point counter Point' নামে প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই কাগজটির সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন দেবেশ রায়। পরবর্তীতে দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় তিনি নিয়মিত সাংবাদিক রচনা লিখে গেছেন এবং মাঝে মাঝে এখনও লিখছেন।

জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত 'জনমত' ও 'ত্রিস্রোতা' থেকে শুরু করে কলকাতায় গিয়ে 'কালান্তর', 'প্রতীক্ষণ', 'Point counter Point', 'আজকাল' পত্রিকায় প্রকাশিত সাংবাদিক রচনাগুলি নিয়ে পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে 'নিজস্ব সংবাদ' নামে তাঁর সাংবাদিক রচনা সংকলন প্রকাশিত হয়। ২০০০ সালে তাঁর আর একটি সাংবাদিক রচনা সংকলন 'আর একটা কলকাতা' প্রকাশিত হয়।

সাহিত্য রচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

''সাংবাদিকতার কাজ তথ্য নিয়ে, গল্প উপন্যাসের কাজ ও তথ্য নিয়ে। সাংবাদিকতা তথ্যের সেই ভিত্তিটা তৈরি করে দিতে পারে, যে ভিত্তির ওপর নির্ভর করে গল্প-উপন্যাসে তথ্যের একটা মানব দলিল নির্মাণ

করা যায়। ... সাংবাদিকতা ভাষাকে নষ্ট করে না, ভাষাকে পুষ্ট করে। তথ্য নির্ভরতায় আর তথ্য বর্ণনায় ব্যবহৃত হতে হতে ভাষার একটা শক্ত ভিত তৈরি হয়ে যায়। ... কিন্তু যে সাংবাদিকতা চলমান ইতিহাসের আধার, তার কাছ থেকে আখ্যান সাহিত্যের গ্রহণ করার আছে অনেক। ... কিন্তু আমার ক্ষেরে সাহিত্য আর সাংবাদিকতার মাঝখানের সীমা রেখাটি অনেক সময়ই আমি অস্পষ্ট করে তুলি যাতে আমার আখ্যান সাংবাদিক হয়ে ওঠে, যাতে সেই আখ্যানের ভিতর সঞ্চারিত হয়ে যায় সাংবাদিকতার তৎপরতা, যাতে ব্যবহৃত শব্দগুলি এক-একটা তথ্যে ভরাট হয়ে উঠতে পারে।''[৮]

এভাবেই তিনি তাঁর সাংবাদিক ও সাহিত্যিক সত্ত্বার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন।

দেবেশ রায়ের সাহিত্যকৃতি :

১৯৫৫ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাড়কাটা' গল্পটি প্রকাশের মধ্যদিয়েই সাহিত্যাঙ্গণে পা রাখেন দেবেশ রায়। গল্পটি প্রকাশের সময় তিনি জলপাইগুড়ি আনন্দচন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিলেন। একজন কলেজ পড়ুয়ার লেখা এই গল্পটি সেই সময় পাঠক সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি তাঁকে সাহিত্যিকের আসনে বসিয়ে ছিল। পরবর্তী সময়ে তাঁর গল্প ও উপন্যাসগুলি পাঠকের চাহিদা পূরণে সমর্থ হয়েছে—এই সময়ে দাঁড়িয়ে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

গল্পকার দেবেশ রায় :

সাহিত্যিক হিসেবে দেবেশ রায়ের আত্মপ্রকাশ একজন গল্পকার হিসেবে। ১৯৫৫ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত তিনি প্রায় শতাধিক গল্প লিখেছেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলি বাংলা ছোটগল্প সাহিত্য শাখাটির ধারাবাহিকতা রক্ষার পাশাপাশি তাঁর রচিত গল্পগুলি সমকালীন সমাজবাস্তবতার অসামান্য দলিল। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র (৬টি খণ্ডে) প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে লেখকের চারটি গল্প সংকলন বেরিয়ে ছিল। ' দেবেশ রায়ের গল্প' (১৯৬৯), 'দুই দশক' (১৯৮২), ' দেবেশ রায়ের ছোটগল্প' (১৯৮৮), 'স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন' (১৯৯১)—এই চারটি গল্প সংকলনে মোট ২৪টি গল্প

প্রকাশিত হয়েছিল। এই কয়েকটি গল্পের বাইরে বিভিন্ন সময় প্রকাশিত দেবেশ রায়ের বিপুল গল্প সম্ভার সংকলিত হয় গল্প সমগ্রের ৬টি খণ্ডে। গল্প সমগ্রের প্রথম খণ্ডে স্থান পেয়েছে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত লেখা গল্পগুলি। প্রথম খণ্ডের গল্পগুলি সম্পর্কে লেখক জানিয়েছেন—''প্রথম খণ্ডে রাখতে চেয়েছি সেই সময়ের লেখা গল্পগুলো যখন গল্প ছাড়া অন্য কোন চেহারায় আমি লেখালেখির কথা ভাবতে পারতাম না।''[৯] বিশ শতকের পাঁচের দশকের বাংলা গল্পের বিষয় ও ফর্ম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। মূলত সেই সময় কিংবা তার সামান্য কিছু পরবর্তী সময়ে এই পর্বের গল্পগুলি লেখা হয়েছিল। আবাল্য রাজনীতির পরিবেশে বেড়ে উঠলেও প্রথম খণ্ডের গল্পগুলিতে রাজনীতি গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে নি, অধিকাংশ গল্পগুলিতে বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আশা-আকাঙক্ষা ও সমাজ বাস্তবতার বাস্তবচিত্র, পাশাপাশি ধ্বনিত হয়েছে ব্যক্তি স্বাধীনতার সুর। ২১ টি গল্প নিয়ে সংকলিত গল্পসমগ্র প্রথম খণ্ড। এই খণ্ডের গল্পগুলি হল—

গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূল :

গল্প	**রচনাকাল**	**প্রকাশিত পত্রিকা**
১. 'হাড়কাটা'	১৯৫৫	'দেশ'
২. 'নাগিনীর উপমেয়'	১৯৫৭	'দেশ'
৩. 'আহ্নিক গতি ও মাঝখানের দরজা'	১৯৫৭	'দেশ'
৪. 'অপরাহ্নের কান্না'	১৯৫৭	'একতা'
৫. 'সাত হাটের হাটুরে'	১৯৫৮	'পরিচয়'
৬. 'দুপুর'	১৯৫৮	'দেশ'
৭. 'শামুক'	১৯৫৮	'একতা'
৮. 'বত্রিশ আঙুল'	১৯৫৮	'দেশ'
৯. 'জলধর ব্যানার্জির মৃত্যু'	১৯৫৮	'পরিচয়'
১০. 'স্মৃতিজীবী'	১৯৫৮	'দেশ'
১১. 'পা'	১৯৫৮	'দেশ'
১২. 'কলকাতা ও গোপাল'	১৯৫৯	'পরিচয়'

১৩. ‘কাল রাতের বেলায়’	১৯৫৯	‘ছোটগল্প’
১৪. ‘অসুখ’	১৯৫৯	‘দেশ’
১৫. ‘পশ্চাৎভূমি’	১৯৬০	‘পরিচয়’
১৬. ‘বেড়ালটির জন্য প্রার্থনা’	১৯৬০	‘মানস’
১৭. ‘ইচ্ছামতী’	১৯৬০	‘পরিচয়’
১৮. ‘পায়ে পায়ে’	১৯৬১	‘দেশ’
১৯. ‘অপেক্ষায়’	১৯৬১	‘দেশ’
২০. ‘দুঃসাময়িক’	১৯৬১	‘ছোটগল্প’
২১. ‘দাহনবেলা’	১৯৬১	‘পরিচয়’

১৯৬১-র পর থেকে দেবেশ রায় গল্প লেখার পাশাপাশি উপন্যাস রচনাও শুরু করেন। ১৯৬২ থেকে ৬৭’র মধ্যে লেখা গল্পগুলি নিয়েই প্রকাশিত হয় ‘গল্পসমগ্র’ দ্বিতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে মোট ২৩টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি সম্পর্কে ভূমিকা অংশে গল্পকার লিখছেন—

> ‘‘আজ যখন এই ’৬২ থেকে ’৬৭ সালের ভিতর লেখা গল্পগুলি পড়ছি, এই বইয়ের জন্য সেই গল্পগুলির প্রুফ বারবার পড়েছি, যেমন পড়তে হত গল্পগুলি লেখার সময়, তখন নিজেরই চোখে পড়ে যায়—এই সময় দলীয় রাজনীতির বাধ্যতায়, সংসদীয় রাজনীতির নিয়মে, সাংগঠনিক রাজনীতির অনিবার্যতায় যতই আমাকে দৈনন্দিন কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদে ঢুকতে হয়েছিল। আমার গল্পগুলোর বাক্য ততই হয়ে উঠতে চেয়েছিল জটিলতর, প্রত্যক্ষ ঘটনা ততই অন্বিত হয়ে যাচ্ছিল পরোক্ষের সঙ্গে।’’[১০]

১৯৬২ তে ভারত চীন যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে যাওয়া—পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতিতে ডামাডোল পরিস্থিতির সময় মূলত এই খণ্ডের গল্পগুলি রচিত হয়েছিল। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী দেবেশ রায়কে সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি তাঁর মতাদর্শের ভিত টলাতে না পারলেও বাস্তব সামাজিক পরিস্থিতি যে তাঁর লেখক সত্তাকে স্বভাবতই

আলোড়িত করেছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুলি হল—

গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূহ :

গল্প	**রচনাকাল**	**প্রকাশিত পত্রিকা**
১. 'ক্ষয় ও তার প্রতিকার'	১৯৬২	'দেশ'
২. নিরস্ত্রীকরণ কেন'	১৯৬২	'পরিচয়'
৩. 'উদ্বাস্তু'	১৯৬২	'পরিচয়'
৪. 'মৃত জংশন ও বিপজ্জনক ঘাট'	১৯৬২	'নতুন সাহিত্য'
৫. 'দুর্ঘটনা ও তার প্রতিকার'	১৯৬২	'উত্তরকাল'
৬. 'মর্তের পা'	১৯৬২	'মহেঞ্জোদারো'
৭. 'বটা সান্যালের অন্তর্দ্বন্দ্ব'	১৯৬৩	'পরিচয়'
৮. 'কলকাতা'	১৯৬৩	'পরিচয়'
৯. 'অমলেন্দুর মালতীর ও আরো কয় প্রকারের ভালবাসা'	১৯৬৩	'শারদীয় কালান্তর'
১০. 'যুযুৎসু'	১৯৬৩	'পরিচয়'
১১. 'দখল'	১৯৬৩	'শারদীয় স্বাধীনতা'
১২. 'সাধারণ চক্কোত্তির জীবনসূত্র'	১৯৬৩	'সম্প্রতি'
১৩. 'তিন পুরুষের উপাখ্যান'	১৯৬৪	'পরিচয়'
১৪. 'অপভাবনা'	১৯৬৪	'এক্ষণ'
১৫. 'রঞ্জুর রক্ত'	১৯৬৪	'পরিবেশ'
১৬. 'ক্ষুধায় জন্মমৃত্যু'	১৯৬৪	'শারদীয় কালান্তর'
১৭. 'একটি দলিল চিত্র'	১৯৬৫	'পরিচয়'
১৮. সতী মিলিদের নিয়ে'	১৯৬৫	'এক্ষণ'
১৯. 'জননী! জন্মভূমি!!'	১৯৬৫	'উত্তরতরঙ্গ'
২০. 'মিলন পিয়াসী'	১৯৬৬	'পরিচয়'

২১. 'ধর্না'	১৯৬৭	'পরিচয়'
২২. 'অনাসক্ত'	১৯৬৭	'এক্ষণ'
২৩. 'বানা'	১৯৬৭	'শারদীয় কালান্তর'

এই খণ্ডের পরিশিষ্ট অংশে আরও ৬টি গল্পের উল্লেখ রয়েছে। এই গল্পুলি হল— 'বাজি', 'ক্রীতদাস', 'ইতিহাসের বরিবারের সকাল', 'রথের মেলায় নিরুদ্দেশ', 'সনাক্তকরণ' ও 'মাগো বন্দেমাতরম'। তবে দ্বিতীয় খণ্ডে এই গল্পগুলি সংকলিত হয়নি। তার অন্যতম কারণ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর পরবর্তীতে গল্পগুলির আর কোন কপি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৯৬৮ থেকে ১৯৭৭ সালে লেখা গল্পগুলির সংকলন দেবেশ রায়ের গল্পসমগ্র তৃতীয় খণ্ড। এই সময় পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ সময় ১৯৬৭ তে যুক্তফ্রন্টের ক্ষমতায় আসা এবং অল্প দিনের মধ্যে সেই সরকারের পতন। ১৯৬৯ তে পুনরায় ক্ষমতা লাভ। সেই সময় বামপন্থীদের অন্তর্কলহ, পার্টির সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বেশিরভাগ উত্তরবঙ্গের গ্রামগুলিতে যেতে শুরু করেছিলেন লেখক। এছাড়াও এই সময় তিনি লিখেছেন একের পর আর এক উপন্যাস এবং ১৯৭৫ সালে কলকাতায় চলে যাওয়ায় নানা কারণে তিনি বেশি গল্প লিখতে পারেন নি। লেখক নিজেই জানিয়েছেন—

> ''গল্পগুলো এই ধারাবাহিকতাতে লেখা হলেও, এখন দেখা যাবে মাঝে মাঝে ফাঁক থেকে গেছে। যেমন '৬৮ সালে আমি ঐ একটা মাত্রই গল্প লিখেছিলাম, বা ৬৯-৭০ , '৭২ সালে বা '৭৫ সালে কিছুই লিখিনি।''[১১]

তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত গল্পের সংখ্যা ১২টি গল্পগুলি হল—

গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূহ :

গল্প	**রচনাকাল**	**প্রকাশিত পত্রিকা**
১. 'রাষ্ট্রপতি শাসনে'	১৯৬৮	'শারদীয় কালান্তর'
২. 'জয় যাত্রায় যাও হে'	১৯৭১	'পরিচয়'
৩. 'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে'	১৯৭১	'গল্প-কবিতা'
৪. 'রাখি পূর্ণিমার রাত'	১৯৭১	'শারদীয় কালান্তর'

৫. 'মানুষ রতন'	১৯৭১	'পরিচয়'
৬. 'সাপের সঙ্গে সহবাস'	১৯৭৩	'শারদীয় দেশ'
৭. 'কয়েদখানা'	১৯৭৪	'পরিচয়'
৮. 'অনৈতিহাসিক'	১৯৭৪	'শারদীয় দেশ'
৯. 'আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম'	১৯৭৬	'শারদীয় কালান্তর'
১০. 'জরিপ'	১৯৭৬	'শারদীয় কালান্তর'
১১. 'রক্তের অসুখ'	১৯৭৭	'অমৃত'
১২. 'মূর্তির মানুষ'	১৯৭৭	'পরিচয়'

তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলি লেখার সময় থেকেই তিনি ক্রমশ প্রবল ভাবে উপন্যাস রচনায় আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাসের সীমারেখা ভেঙে ফেলতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি কিছুটা সফলও হয়েছেন। যাইহোক উপন্যাস লেখার প্রবণতায় তাঁর গল্পের সংখ্যা এই সময় থেকেই ক্রমশ কমে যেতে থাকে। এছাড়াও এই সময় দাদা দিনেশচন্দ্র রায় ও বন্ধু দীপেন্দ্রনাথের মৃত্যু তাঁর সাহিত্য রচনা কিছু কালের জন্য স্তব্ধ করেছিল। ১৯৭৮ থেকে '৮৬-র মধ্যে রচিত গল্পগুলি নিয়ে প্রকাশিত হয় গল্পসমগ্র চতুর্থ খণ্ড। এতে মোট ১০টি গল্প সংকলিত হয়েছে। গল্পগুলি হল—

গল্পসমগ্র, চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূহ :

গল্প	**রচনাকাল**	**প্রকাশিত পত্রিকা**
১. 'উচ্ছেদের পর'	১৯৭৯	'শারদীয় পরিচয়'
২. 'জোতজমি'	১৯৭৯	'শারদীয় বারোমাস'
৩. 'সাইক্লোনের চোখ'	১৯৮০	'শারদীয় পরিচয়'
৪. 'যৌবন বেলা'	১৯৮০	'শারদীয় পরিচয়'
৫. 'শরীরের রকমফের'	১৯৮২	'বারোমাস'
৬. 'মানচিত্রের বাইরে'	১৯৮৩	'বারোমাস'
৭. 'অন্ত্যেষ্টির রীতিবিধি'	১৯৮৪	'বারোমাস, শারদীয় পরিচয়'
৮. 'আইনানুক ও প্রমোদকরহীন'	১৯৮৪	'শারদীয় যুগান্তর'

৯. 'মুখের সত্যমিথ্যা'	১৯৮৫	'শারদীয় কালান্তর'
১০. 'জন্ম-প্রজন্ম'	১৯৮৬	'শারদীয় আজকাল'

১৯৮৭ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে লেখা গল্পগুলির সংকলন-গল্পসমগ্র পঞ্চম খণ্ড। এই সময় তিনি বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদনার কাজে আষ্ঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে এই সময় রচিত গল্পগুলির ভাষাকে তিনি নিরস করে তুলেন নি। কেননা, তাঁর কাছে সাংবাদিকতা সাহিত্যের বিষয়কে তথ্য ভারাক্রান্ত নয় তথ্যসমৃদ্ধ করে। এই খণ্ডের গল্পগুলি হল—

গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূহ :

গল্প	**রচনাকাল**	**প্রকাশিত পত্রিকা**
১. 'স্মৃতিহীন বিস্মৃতিহীন'	১৯৮৭	'আজকাল, শারদীয়'
২. 'স্বদেশ বিদেশ'	১৯৮৭	'বারোমাস, শারদীয়'
৩. 'মুখের দরদাম'	১৯৮৮	'গল্পপত্র, প্রথম সংখ্যা'
৪. 'বৃষ্টিবদল'	১৯৮৮	'যুগান্তর, শারদীয়'
৫. 'স্বপ্ন জাগরণের ব্রত'	১৯৮৮	'গল্পপত্র, শারদীয়'
৬. 'একই উপকথার দুই আরম্ভ'	১৯৮৯	'গল্পপত্র, শারদীয়'
৭. 'জীবনানন্দের মুখ'	১৯৮৯	'আজকাল, শারদীয়'
৮. 'ছেলেরা করে খেলা'	১৯৯০	'বারোমাস, নববর্ষ'
৯. 'আমিষ নিরামিষ'	১৯৯০	'গল্পপত্র, শারদীয়'
১০. 'আত্মসচেতনতার ফাঁকফোকর'	১৯৯০	'মিরান্দা, শারদীয়'
১১. 'অসংরক্ষণ'	১৯৯০	'কালান্তর, শারদীয়'
১২. 'ভয়'	১৯৯১	'বারোমাস, শারদীয়'
১৩. 'গীতাল যুগীনের টেকনোলজি গ্রহণ'	১৯৯১	'বারোমাস, শারদীয়'
১৪. 'নদীরাম জঙ্গলরাম'	১৯৯১	'কালান্তর, শারদীয়'
১৫. 'বৃষ্টি কলরোল'	১৯৯১	'নন্দন, শারদীয়'

১৬. ‘গ্লোবালাইজেশন’ ১৯৯৪ ‘বারোমাস, শারদীয়’

১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ সালের মধ্যে রচিত গল্পগুলি সংকলিত হয় গল্পসমগ্র ষষ্ঠ খণ্ডে, গল্প সংখ্যা ৯টি। এই সময় থেকে তাঁর গল্পের সংখ্যা অনেকটাই কমে যায়। এই খণ্ডে সংকলিত গল্পগুলি হল—

গল্পসমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পসমূহ :

গল্প	**রচনাকাল**	**প্রকাশিত পত্রিকা**
১. ‘বাণিজ্য যাত্রারই একধরণ’	১৯৯৫	‘বারোমাস, শারদীয়’
২. স্বর্ণদুর্গার উপাখ্যান’	১৯৯৫	‘কালান্তর, শারদীয়’
৩. ‘বাবা গীতালের শেষযাত্রা’	১৯৯৬	‘কালান্তর, শারদীয়’
৪. ‘গান্ধারীর চোখ’	১৯৯৬	‘কালান্তর, শারদীয়’
৫. ‘শব্দতত্ত্ব নিয়ে’	১৯৯৭	‘কালান্তর, শারদীয়’
৬. ‘তিস্তাপুরাণ’	১৯৯৭	‘পরিচয়, শারদীয়’
৭. ‘বাঁচা না বাঁচার নিশানা’	১৯৯৮	‘দেশ, শারদীয়’
৮. ‘উড়িয়াল’	১৯৯৮	‘প্রমা, শারদীয়’
৯. ‘খা’	১৯৯৮	‘কালান্তর, শারদীয়’

এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেশ রায়ের অনেকগুলি গল্প প্রকাশিত হয়। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি হল—

গল্প :

১. ‘তালপাতার পুঁথি’ — আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১.৬.১৯৫৮

২. ‘তারা খোঁজার মাটি’ — আজকাল, (দৈনিক), ১৪.৪.১৯৯২

৩. ‘ফাজিল খাতা’ — যুগন্ধর, জানুয়ারি- ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৮

৪. ‘মিঠির মেজমামা’ — আজকাল (দৈনিক), রবিবাসর, ১৬,৫,১৯৯৯

৫. ‘ফেরা না ফেরার গল্প’ — কালপ্রতিমা সাহিত্য পত্র, একাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, শারদীয়, ২০০৪

৬. ‘এখন বিনিয়োগকাল’ — হৃদয়, বার্ষিক সংকলন, জানুয়ারি, ২০০৫

৭. ‘পেজমার্ক’ — পরিচয়, মে-অক্টোবর, ২০০৮

৮. ‘ক্ষুরধার নগর’ — অন্তঃসার, সেপ্টেম্বর, ২০০৮

৯. ‘মৃত্যুর গর্জন, দীন ও উদাসীন’ — গল্পপত্র, সেপ্টেম্বর, ২০০৭

১০. ‘পরণ কথার পুরুষ’ — কালান্তর, শারদীয়, ২০০৯

১১. ‘রুমেলিয়াকে বাঁচানো ও
রুমেলিয়ার মরে যাওয়ার
সামান্য কারণগুলি’ — পরিচয়, শারদীয়, ৭৯ বর্ষ, আগস্ট-অক্টোবর, ২০০৯

১২. ‘বাড়ি ফেরার পথ ও লেখক’ — পরিচয়, আগস্ট-অক্টোবর, ২০১০

১৩. ‘ত্রাণ সচিবের টুরের আগরে সন্ধ্যা’— কালান্তর, শারদীয়, ১৪১৮

১৪. ‘বলহরি ঘোষের পুনরুদ্ধার’ — গল্পগুচ্ছ, শারদীয়, ২০১২

১৫. ‘ক্ষিধের পোষ্ট মর্ডাণ’ — পরিচয়, শারদীয়, ২০১২

১৬. ‘বুবকার অনন্ত এক মিনিট’ — অদ্বিতীয়া, শারদীয়, ২০১২

ঔপন্যাসিক দেবেশ রায় :

বাংলা সাহিত্যের অঙ্গণে দেবেশ রায়ের আর্বিভাব গল্পকার হিসেবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি সাফল্যের শিখর স্পর্শ করেছেন ঔপন্যাসিক হিসেবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৬৯-র পর তিনি গল্প লেখার পাশাপাশি উপন্যাস নিয়েও ভাবতে শুরু করেছেন। ১৯৬৫-র ভেতরে তিনি ‘মানুষ খুন করে কেন’ উপন্যাসটির প্রথম খসড়া করে উপন্যাস কাকে বলে তা বুঝতে চেয়েছিলেন। যদিও উপন্যাসটি শেষ করতে তাঁর প্রায় ১৩ বছর সময় লেগে ছিল। এর মধ্যেই তিনি রচনা করেন ‘যযাতি’ যা গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৭৩ এ। সেই দিক থেকে ‘যযাতি’ দেবেশ রায়ের প্রথম উপন্যাস। ‘যযাতি’র রচনা কাল ১৯৬৮। এই সময়ের মধ্যেই তিনি রচনা করেন—‘বেঁচে বততে থাকা’। এই রচনা সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য তা নিজের বেগেই উপন্যাস হয়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে তিনি বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজকে উপহার দিয়েছেন একের পর এক কালজয়ী উপন্যাস। তাঁর প্রকাশিত উপন্যাসগুলি

হল—

উপন্যাস :

	প্রকাশিত পত্রিকা	**গ্রন্থাকারে প্রকাশিত**
১. 'কালীয় দমন'	'সপ্তর্ষি'তে প্রকাশিত, ১৯৬১	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
২. 'যযাতি'	'পরিচয়' (১৯৬৪-১৯৬৮)	১৯৭৩
৩. আপাতত শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে	'দেশ' (শারদীয় সংখ্যা) 'কালান্তর' (ঐ) 'পরিচয়' (ঐ)	১৯৭৬
৪. 'মানুষ খুন করে কেন'	—	১৯৭৬
৫. 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'	—	১৯৮০
৬. 'বেঁচে বততে থাকা'	—	১৯৮৪
৭. 'সমুদ্রের লোকজন'	'বসুমতী' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৮৫	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
৮. 'স্বামী স্ত্রী'	'বারোমাস' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৭৮	১৯৮৬
৯. প্রেতচ্ছায়ে ঘোরাফেরা'	—	১৯৮৬
১০. 'সহমরণ'	'অমৃত' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৮১	১৯৮৮
১১. 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'	—	১৯৮৮
১২. 'আত্মীয় বৃত্তান্ত'	'বসুমতী' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৮১	১৯৯০
১৩. 'জীবন চরিতে প্রকাশ'	—	১৯৯০
১৪. 'হনন আত্মহনন'	—	১৯৯০
১৫. 'স্বদেশ বিদেশ	'আজকাল' (শারদীয় সখ্যা)	১৯৯২

	১৯৯০	
১৬. 'ইতিহাসের লোকজন'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৯১	১৯৯২
১৭. 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত'	১৯৮৩ থেকে শারদীয় প্রতিক্ষণ, শারদীয় আজকাল, শারদীয় কালান্তর, শারদীয় প্রমা ও শারদীয় বারোমাস বিভিন্ন পত্রিকায়	১৯৯৩
১৮. 'খরার প্রতিবেদন'	—	১৯৯৩
১৯. 'দাঙ্গার অ সম্পূর্ণ প্রতিবেদন'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৯৩	১৯৯৪
২০. 'দাঙ্গার অ সম্পূর্ণ প্রতিবেদন'	—	১৯৯৪
২১. 'একটি ইচ্ছা মৃত্যুর প্রতিবেদন'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৯৪	১৯৯৫
২২. 'লগন গান্ধার'	'প্রতিক্ষণ' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৯৪	১৯৯৫
২৩. 'শিল্পায়নের প্রতিবেদন'	—	১৯৯৬
২৪. 'জন্ম'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৯৬	১৯৯৭
২৫. 'উচ্ছিন্ন উচ্চারণ'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ১৯৯৭	১৯৯৮
২৬. 'তিস্তা পুরাণ'	—	২০০০
২৭. 'চেতাকে নিয়ে চীবর'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০০০	২০০১

২৮. 'মারি'	—	২০০২
২৯. 'যুদ্ধের ভিতরে যুদ্ধ'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০০১	২০০৩
৩০. 'মার বেতালের পুরাণ'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০০২	২০০৪
৩১. 'আঙিনা'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা)	২০০৫
৩২. 'ব্যক্তিগত ফ্যাসি বিরোধী যুদ্ধ নিয়ে একটি উপন্যাস'	—	২০০৬
৩৩. 'যীশুর পবিত্র পদতল থেকে'	'কালপ্রতিমা', সাহিত্যপত্র, ১৩ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২০০৬	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
৩৪. 'সারফিউ'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা)	২০০৭
৩৫. 'অতল জলের তলে'	'অন্তঃসার' (শারদীয় সংখ্যা) ২০০৬	২০০৭
৩৬. 'এ কে ৪৭'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০০৭	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
৩৭. 'যৌনলেখ'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০০৯	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
৩৮. 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল'	—	২০১০
৩৯. 'রতিলেখ'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০১১	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
৪০. 'এখনকার কিছু ব্যবসা বাণিজ্য ও অসুখ-বিসুখ'	'সৃষ্টির একুশ শতক', (শারদীয় সংখ্যা), ২০১২	গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত
৪১. 'দূরতর জন্মভূমি'	'আজকাল' (শারদীয় সংখ্যা) ২০১২	অপ্রকাশিত

৪২. 'সিনেমা মতো খুনোখুনি 'বারোমাস' (শারদীয় সংখ্যা) ২০১৩

হাফটাইম পর্যন্ত' ২০০৪

প্রাবন্ধিক দেবেশ রায় :

গল্প, উপন্যাস রচনার পাশাপাশি দেবেশ রায়ের প্রাবন্ধিক সত্তার পরিচয়ও সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম প্রবন্ধ সংকলন 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য'। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে লেখকের ১৬টি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। দেবেশ রায়ের প্রকাশিত প্রবন্ধ সংকলনগুলি হল—

প্রবন্ধ গ্রন্থ :

১. রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর আদি গদ্য (প্রবন্ধ সংকলন) ১৯৭৮

২. উপন্যাস নিয়ে (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৯১

৩. শিল্পের প্রত্যহ (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৯২

৪. তৃপাকে একতোড়া (প্রবন্ধ সংকলন), ২০০০

৫. অপর ভাষা (প্রবন্ধ সংকলন), ২০০৩

৬. উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে (প্রবন্ধ সংকলন), ২০০৬

৭. বিপরীতের বাস্তব (প্রবন্ধ সংকলন), ২০০৮

৮. রবীন্দ্রনাথের গল্প (প্রবন্ধ সংকলন)

৯. অলৌকিকের টানে, রবীন্দ্রনাথের গান (প্রবন্ধ সংকলন), ২০০৯

১০. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিরন্তর মানুষ (প্রবন্ধ সংকলন), ২০১০

১১. অল্প কিছু আলো, আমাদের ভালো থাকা নিয়ে বলা কথা (প্রবন্ধ সংকলন), ২০১২

আঠারো শতকের বাংলা গদ্য :

১. চিঠি পত্রে কিছু নতুন প্রমাণ (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৮৭

২. আত্ম জীবনীর গোপন পাঠ (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৮৮

৩. উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সামাজিক গদ্য (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৯০

৪. সময় সমকাল (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৮৪

৫. তারাশঙ্কর নিরন্তর দেশ (প্রবন্ধ সংকলন), ২০০৩

৬. ব্যক্তি পুরুষেরা (প্রবন্ধ সংকলন), ১৯৯৫

দেবেশ রায় একাধারে যেমন গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক তেমনি তিনি বিশিষ্ট সমালোচকও বটে। সৃষ্টিশীল রচনার পাশাপাশি তিনি নিজের সমালোচক সত্তাকেও সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর সমালোচনা মূলক রচনাগুলি হল—

পুস্তক সমালোচনা :

অশ্বমেধের ঘোড়া	—	১৯৬৩
এক আশ্চর্য অভিযান	—	১৯৯৭
কথাসাহিত্যের নতুন সংজ্ঞা	—	১৯৭৪
কবির ছলনা	—	১৯৯৭
চাঁদ বণিকের পালা	—	১৯৮০
নাটকের রবীন্দ্রনাথ	—	২০০১
পরিবেশ, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষের বৃত্তান্ত	—	১৯৭৫
পান্থ জনের সখা	—	১৯৭৩
বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তন	—	১৯৬২
হওয়া না হওয়া সময়ের নায়ক	—	১৯৭২
বাংলা গল্পের আয়তন	—	১৯৮৫
ছোটগল্প : দুই মেজাজ	—	১৯৬৫
আদব থেকে বিবর	—	১৯৬৬
সমালোচনায় আত্মজিজ্ঞাসা ও অহমিকা	—	১৯৭৭
বাংলা বানান : শ্রী মণীন্দ্রকুমার ঘোষ	—	১৯৮০

অন্যান্য :

আর একটা কলকাতা (সাংবাদিক রচনা)	—	২০০০
গুড়িয়া ঘর (নাটক সমালোচনা)	—	১৯৮১
নিজস্ব সংবাদ (সাংবাদিক রচনা সংকলন)	—	১৯৯২
মিতানকে নিয়ে বাড়াবাড়ি (ছড়া সংকলন)	—	২০০৩
যুগান্ত : নতুন আধুনিকতা (চলচিত্র সমালোচনা)	—	২০০৬
সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে (সংগীত আলোচনা)	—	১৯৯১

স্মৃতিমূলক রচনা :

আগুনের পরশমণির ছোঁয়া	—	১৯৯৯
আমি, আমরা আমাদের, ওরা ওদের	—	২০০০
জলের মিনার জাগাও	—	২০০২
ডিকশনারি	—	২০০০
মহাদেশের রাষ্ট্রদূত	—	২০০৭
দীপেন- দেবেশের দীপেন	—	১৯৯৯
সোমনাথ লাহিড়ী স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা	—	১৯৮৪

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী দেবেশ রায়। একদা কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী থাকার সুবাদে সমাজের সর্বস্তরের সর্ব শ্রেণির মানুষের সঙ্গে সাধারণ জীবনযাপন করেছিলেন। এই জীবন তাঁর সাহিত্যের আখ্যান নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। একক জীবন দিয়ে বহু স্তরীয় জীবনের স্বাদ তাঁর লেখনীতেও নিয়ে এসেছে রস-বৈচিত্র্য। তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তথ্যসূত্র :

১. বারোমাস, শারদীয় সংখ্যা ২০০৫, জলের মিনার জাগাও, পৃ. ৩১৬।

২. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৫।

৩. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১১-১২।

৪. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৫-৬।

৫. তদেব, : পৃ. ৬।

৬. তদেব, : পৃ. ১০।

৭. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১৩।

৮. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, পঞ্চম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৫।

৯. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১১।

১০. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৩।

১১. রায়, দেবেশ : গল্পসমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ১২।